ভূমিকা

"সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়
অবসাদ নেই তার? নেই তার শান্তির সময়?"

['বোধ' – জীবনানন্দ]

বাংলা নাটকের উজ্জ্বল আকাশে এক বহুমুখী প্রতিভাবিদ্যুৎ হলেন ব্রাত্য বসু। এই সময়ের অনুরণন, আবেদন, আস্ফালন, অভিযোজন সবটা প্রকাশিত হয় ওঁনার লেখা নাটকে। ব্রাত্য বসু বর্তমান নাট্যজগতে একক এবং অদ্বিতীয়। তিনি জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা বলেন। তাঁর কথা, তাঁর বোধ ছড়িয়ে পড়ে নাটকের সংলাপে, চরিত্রে, সর্বোপরি দর্শক এবং পাঠক সমাজের মনের মধ্যে। একজন মানুষ কি করে অতিমানবিক হয়ে ওঠেন তার হয়তো জীবন্ত নিদর্শন শ্রী ব্রাত্য বসু। অধ্যাবসায়, নিরলস বিদ্যাচর্চা, প্রখর স্মৃতিশক্তি এবং অদম্য জেদ— এই সবকিছুর আধার হলেন উনি। একবার সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে বাংলা নাটক শুধু নাটকের দলের ছেলেমেয়েদের হাতেই ঘোরাফেরা করে, তা কখনো সাহিত্য হয়ে ওঠে না বা বৃহত্তর পাঠক সমাজ নাটক পড়েন না। একথা কিন্তু অনেকাংশেই সত্যি কারণ সাহিত্যের অন্যান্য শাখা অর্থাৎ গল্প, কবিতা, উপন্যাস সকলেই কমবেশি পড়েন কিন্তু সেই তুলনায় নাটকের পাঠক সংখ্যা কম। তবে ব্রাত্য বসুর নাটকের ক্ষেত্রে একথা প্রযোজ্য নয় কারণ ব্রাত্যর নাটক একদিকে যেমন মঞ্চ সফল অর্থাৎ যাকে বলে সুপারহিট প্রযোজনা অন্যদিকে নাটকগুলি সাহিত্যরসে পরিপূর্ণ।

ব্রাত্য বসুর নাটকের, নাটককার হিসেবে ব্রাত্য বসু এর থেকে ভালো বিশ্লেষণ হয়তো হয় না। নাটকের টেক্সট মূলত নাট্যকর্মীরাই অভিনয়ের তাগিদে পড়ে এবং মুখস্থ করে। তার মধ্যে কতোটা সাহিত্যরস আস্বাদন জড়িত এ বিষয়ে সংশয় রয়েছে কিন্তু অনেকদিন পর বাংলা সাহিত্য পাঠকের কাছে সমাদৃত এবং প্রশংসিত হল ব্রাত্য বসুর

লেখা নাটকগুলি। এই বিষয়টি নিঃসন্দেহে বাংলা নাট্যজগতে এবং সাহিত্যজগতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন।

বাংলা নাট্যজগতে ব্রাত্য বসুর পদার্পণ ও তাঁর নাটক লেখা শুরু বিষয়টি বলতে গেলে খানিকটা 'ধান ভানতে শিবের গীত'-এর মতো একটু পেছন ফিরে দেখতে হবে। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ, বাংলায় গেরাসিম লেবেদফের হাত ধরে নাটক ও নাট্যচর্চার সূত্রপাত। এরপর অভিজাত বাঙালি বাবুদের সৌখিন নাট্যশালার যাত্রা শুরু। এরপর পেশাদারী রঙ্গমঞ্চ সৃষ্টি হয়। সেখানে বিনোদনের জন্য যেমন নাটক নির্মাণ হতো তেমনি নাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন হতো। প্রচুর মানুষ পেশা হিসেবে জীবিকার তাগিদে নাট্যশিল্পের সাথে যুক্ত হয়েছিলেন। এই পেশাদারী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত নাটকগুলি দেশপ্রেম, জাতীয়তাবাদী, ব্রিটিশবিরোধী চিন্তার জন্ম দিয়েছিল। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে ন্যাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সেখানে অভিনীত 'নীলদর্পণ' নাটক তৎকালীন সমাজে এক ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে।

এরই মধ্যে বাংলা নাট্যজগতে এক স্বতন্ত্র ধারা জন্ম নেয়। এই ধারার নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, সামাজিক নাটক, কৌতুক নাটক, নৃত্যনাট্য, গীতিনাট্য, রূপক সাংকেতিক নাটক লিখেছেন। প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্র নাটকে শেক্সপিয়রের পঞ্চাঙ্ক বিশিষ্ট নাটকের রীতির প্রভাব চোখে পড়ে। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্র নাটকগুলি অনেক বেশি পরিশীলিত ও নাট্যগুণসম্পন্ন হয়। যেমন— 'শারদোৎসব', 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'অচলায়তন', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'কালের যাত্রা' উল্লেখযোগ্য।

এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে যায়। ইংরেজ অধিকৃত ভারতবর্ষ সরাসরি যুদ্ধে যুক্ত হয়ে যায়। সারাবিশ্বে লেখক ও শিল্পীরা ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গর্জে ওঠে। এই বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব ভারতের লেখক ও শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রবাহিত হয়। অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ভারতে অর্থনৈতিক মন্দা, কালোবাজারি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি দেখা যায়। সমস্ত জাতি বেকারত্ব, হতাশার গ্লানিতে জর্জরিত হয়ে পড়ে। এই হতাশার গ্লানি

থেকে পেশাদারী রঙ্গমঞ্চেরও রেহাই মেলেনি। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদী আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ভারতের লেখক-শিল্পীরা সঙ্ঘবদ্ধ হন। ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে 'সারা ভারত প্রগতি লেখক সংঘের' উদ্যোগে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে তৎকালীন বোম্বাইতে 'Indian People's Theatre Association' বা 'গণনাট্য সংঘ' তৈরি হয়। যার স্লোগান ছিল— 'শিল্পের জন্য শিল্প নয়, মানুষের জন্য শিল্প'। এই সময়ের নাটকগুলিতে সমাজের বাস্তব চিত্র, মানুষের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরা হতো। এই নাটকগুলিতে জনজাগরণ, শোষণবিহীন সমাজ, শ্রেণিবিহীন সমাজের স্বপ্ন অঙ্কিত হতো। তৎকালীন খাদ্য সংকট ও দুর্ভিক্ষ নিয়ে লেখা বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি বাংলা নাটকের ইতিহাসে বিপ্লবের সূচনা করেছিল।

গণনাট্য সংস্থা প্রথমদিকে জনজাগরণে সমর্থ হলেও কিছুদিনের মধ্যেই ভাঙন দেখা দিলো। বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, গঙ্গাপদ বসু, ঋত্বিক ঘটক সহ আরো অনেকেই গণনাট্য সংঘ থেকে বের হয়ে এলেন। এই মানুষগুলো পরবর্তী সময়ে যে নাট্য প্রচেষ্টা চালালেন তা 'নবনাট্য' আন্দোলন নামে পরিচিত। গণনাট্য ছেড়ে শম্ভু মিত্র ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'বহুরূপী' নাট্যসংস্থা গড়ে তুললেন। বহুরূপীর প্রযোজনায় একের পর এক কালজয়ী নাটক আত্মপ্রকাশ করলো। যেমন— 'রক্তকরবী', 'চার অধ্যায়', 'দশচক্র', 'ধর্মঘট' ইত্যাদি।

এরপর বাংলা থিয়েটারের দু'জন উজ্জ্বল নক্ষত্র হলেন উৎপল দত্ত এবং অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎপল দত্ত সৃষ্টি করেন লিটল থিয়েটার বা এল.টি.জি। তাঁর নির্দেশনায় এল.টি.জি, 'ফেরারি ফৌজ', 'কল্লোল', 'তীর', 'অজেয় ভিয়েতনাম', 'লেনিন', 'টিনের তরোয়াল' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে।

১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে জন্ম নেয় 'নান্দীকার'। প্রতিষ্ঠাতা অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর প্রযোজিত নাটকগুলি হল— 'সিক্স ক্যারেক্টার ইন সার্চ অফ অ্যান অথার' অবলম্বনে 'নাট্যকারের সন্ধানে ছ'টি চরিত্র'। হেনরি IV অবলম্বনে 'শের আফগান', ব্রেখটের থ্রি পেনি অপেরা অবলম্বনে 'তিন পয়সার পালা'।

এর পরবর্তী সময়কালে বাংলা নাটকের জগতে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব হলেন— বাদল সরকার, মোহিত চট্টোপাধ্যায়, মনোজ মিত্র প্রমুখ। এই সকল নাট্যকারের কৃতিত্বকে স্বীকার করে নিয়েও বলতে দ্বিধা নেই নব্বইয়ের দশক থেকে বাংলা নাট্যজগতে ব্রাত্য যুগের সূচনা হয়ে যায়। এই নতুন ব্রাত্য যুগের কাণ্ডারি ব্রাত্য বসু স্বয়ং, তিনি নাটকে শুধু নতুন পথের সন্ধান দেননি; গঠনগত এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকেও ব্রাত্য বসুর নাটক স্বতন্ত্রতার দাবি করে। তিনি আমাদের এই প্রজন্মের একমাত্র নাটককার যিনি সরাসরি নাট্যনির্মানের সাথে যুক্ত, তিনি নাটক লেখার পাশাপাশি নাটকে অভিনয়, নির্দেশনা নাট্য সংগঠন সবকিছুর প্রত্যক্ষ কারিগর এবং সমস্ত ভূমিকাতেই ব্রাত্য সফল। এই সময়ে অর্থাৎ একটি শতাব্দীর সাথে অন্য শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে ব্রাত্য বসুর মতো শক্তিশালী নাটককার পাওয়া দুষ্কর।

নয়ের দশক হল দুটো যুগের সন্ধিক্ষণের সময়, দুটো শতাব্দীর মাঝবরাবর সেতুর মতো। এর আগে সত্তরের দশকে নকশাল আন্দোলনের স্রোত বয়ে গিয়েছে মহানগর থেকে শুরু করে গ্রামবাংলার অন্দরে। আশির দশকে এই আন্দোলনের ঢেউ স্তিমিত, রাজ্যজুড়ে বাম মতাদর্শ বিরাজমান। নয়ের দশকে এসে শিক্ষিত সমাজের চিন্তা-চেতনা ও মননজুড়ে এক প্রবল দাপাদাপি শুরু হল। পুরাতনকে ভেঙে নতুন শতাব্দীকে বরণ করে নেওয়ার তাগিদেই ভাবনা-চিন্তার প্রসারতা জন্ম দিলো নতুন জাগরণের। শিল্পের সমস্ত স্তরেই এই প্রভাব লক্ষ করা যায়। নাটকও এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ছিল না। একদিকে পুরনো পেশাদারী থিয়েটার উঠে গিয়েছিল আর দীর্ঘদিন গ্রুপ থিয়েটার চলতে চলতে অভ্যন্তরীণ সংঘাতে আর সঠিকভাবে গ্রুপ থিয়েটার আদর্শে উত্তীর্ণ হতে পারছিল না। ফলত থিয়েটারের ছায়াপথে ব্ল্যাকহোল তৈরি হল। এই সময়ের নাট্যকর্মী ও নাট্যকারেরা মিলে সেই ব্ল্যাকহোল মেরামতের উদ্যোগ নিলেন। এই উদ্যোগে যিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি হলেন ব্রাত্য বসু।